Rajshahi University journal of arts & law Vol. 51 (2023) pp. 25-33
ISSN 2309-0898

প্রযুক্তির দর্শন ও ভবিষ্যতের মানুষ
[Philosophy of technology and the man in future]

মো. আনিসুজ্জামান*

Abstract

Homo Neanderthal is no more a fiction story in 2023. The Nobel Prize winner in Medicine, Svante Paabo, has done the sequencing of the genome of the Neanderthal. Yuval Noah Harari has mentioned some other species of human existence alongside those of Homo Neanderthal, Homo erectus, Homo soloensis, Homo rudolfensis, and Homo ergaster. Homo sapiens is a wise man. It can be surmised from the research of the genetic engineers that the forefathers of Sapiens used technology. The hunters hunted by using technology. The agricultural civilization is completely dependent on technology. The first and second industrial revolutions made Sapiens dependent more on technology. If the fourth industrial revolution gets fully materialized, then not only humans will be dependent on technology but man's usual ability to work will become dependent on technology to a great extent. The mystery of a wise man's birth and death, that is, the rise and fall of the birth or death rate will be dependent on technology. Man has controlled the birth rate rapidly. Man will delay the process of death using technology in future. Biological Engineering and Cyborg Engineering are advancing fast. Now, connecting artificial intelligence with man's usual intelligence is no longer a science fiction. Cyborg engineering is the combination of the organic and the non-organic. Though the age of technology is the age of man, the philosophy of technology is new in the domin of knowledge. The philosophy of technology gets its sway in the main stream philosophy of after the first and second World Wars. The German philosopher Ernst Christian Kapp (1808-1896) first used the two words "philosophy of technology". The philosophy of technology is one of the branches of knowledge in the era of the Fourth Industrial Revolution.

মূল শব্দ: অ্যান্টিবায়োটিক, নিয়ান্ডারথাল, ইগো, সাইবর্গ, ক্রমোজম, বায়োনিক, জেমিউল, ডিএনএ।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সভান্তে প্যাবো (২০২২) নিয়ান্ডারথালের জিন সিকোয়েন্স করেছেন। তাঁর এই কাজ প্রমাণ করে হোমো নিয়ান্ডারথাল কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। ইয়ুভাল নোয়াহ হারারি হোমো নিয়ান্ডারথাল, হোমো ইরেক্টাস, হোমো সোলোয়েনসিস, হোমো রুডরফেনসিস, হোমো ইরগাস্টারসহ আরো কয়েক ধরনের মানব প্রজাতির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন *স্যাপিয়েন্স গ্রন্থে*। ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার মানুষেরা বিবর্তিত হয়ে হোমা নিয়ান্ডারথালেনসিস নাম নিয়েছে। এর অর্থ হলো নিয়ান্ডার উপতক্যার মানুষ।[১] হোমো স্যাপিয়েন্স হলো জ্ঞানী মানুষ। নিয়ান্ডারথালের পুনরুত্থান চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জর্জ চার্চ বলেছেন, নিয়ান্ডারথালের জিনোম প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর, পুনর্গঠিত নিয়ান্ডারথালের ডিএনএ স্যাপিয়েন্সের গর্ভে স্থাপন করার ফলে প্রথম নিয়ান্ডারথাল শিশুর জন্ম হতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে স্যাপিয়েন্সের উদ্ভব সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে বলে জিন প্রকৌশল বিজ্ঞানীরা মনে করেন।[২]

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ, E-mail: anis_zaman1971@ru.ac.bd

জিন প্রকৌশল গবেষকদের গবেষণা থেকে বলা যায়, স্যাপিয়েন্সের পূর্বপুরুষও প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। শিকারী মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিকার ধরেছে। কৃষিবিপ্লব সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তি নির্ভর। "প্রায় দশ হাজার বছর আগে, স্যাপিয়েন্সরা সমস্ত সময় ও সামর্থ অল্প সংখ্যক কিছু প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের জন্যে ব্যয় করতে শুরু করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের একটাই কাজ ছিল। সংক্ষেপে এটাই হলো কৃষি বিপ্লব।"[৩] পৃথিবীর সব স্থানে একই সময়ে কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষির সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছর পূর্বে।[৪] হারারি লিখেছেন, "২.৫ মিলিয়ন বছর আগে পূর্ব আফ্রিকাতে অস্ট্রালোপিথেকাস নামক একটি আদি গণ থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো। প্রায় ২ মিলিয়ন বছর আগে, এই প্রাচীন মানুষদের একটি অংশ তাদের জন্মভূমি ছেড়ে উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।"[৫] বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায় হোমো স্যাপিয়েন্সের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো।[৬] পূর্ব আফ্রিকা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞানী মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্য এবং নিরাপত্তা ও উন্নত জীবনের আশায় বসতি স্থাপন করে। সমুদ্র পার হয়ে মাত্র ৪৫০০০ বছর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় মানুষের প্রথম বসতি শুরু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বাহ্যিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত মানুষগুলোর প্রত্যেকটিকে বিজ্ঞানীরা ল্যাটিন নামকরণ করেছেন। আধুনিক মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রযুক্তির আধুনিকায়ন করে পৃথিবীর সর্বত্র কর্তৃত্ব করছে।

গ্রিক দার্শনিক জেনো বলেছিলেন পরিবর্তনই সত্য। সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। করোনা ভাইরাসের পরিবর্তন তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। মানুষের পরিবর্তন কোনো এক স্থান থেকে শুরু হয়নি। ইউরোপ এশিয়ার সাথে পূর্ব আফ্রিকায় মানুষের বিবর্তন শুরু হয়েছে। "মানবজাতির আঁতুড়ঘরে জন্ম নিচ্ছিল আর লালিত হচ্ছিলো আরও কিছু প্রজাতি। যেমন হোমো রুডলফেনসিস (Homo rudolfensis) বা 'লেক রুডলফের মানুষ', হোমো ইরগাস্টাস (Homo ergaster) বা 'কর্মী মানুষ' এবং ক্রমান্বয়ে এসেছে আমাদের প্রজাতি, স্পর্ধাবশত আমরা যাদের নাম দিয়েছি হোমো স্যাপিয়েন্স বা 'জ্ঞানী মানুষ'।"[৭] আধুনিক যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিবর্তন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। জেনিটিক্যালি মোডিফাই অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, বেগুনসহ নানা ধরনের ফসলের চাষ হচ্ছে। এসবের কোনটিই আগের অবস্থায় নেই। ২০০০ সালে এদুয়ার্দো ক্যাক (Eduardo Kac) একজন ব্রাজিলিয়ান বায়ো আর্টিস্ট সবুজ ফ্লুরোসেন্ট খরগোশ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন। ক্যাক একটি ফরাসি ল্যাবরেটরিকে তাঁর নিজস্ব রূপরেখা অনুসারে খরগোশ সৃষ্টির দায়িত্ব দেন। ফরাসি বিজ্ঞানীরা একটি সাদা খরগোশের ভ্রূণ সংগ্রহ করে এর ডিএনএতে জেলিফিসের জিন স্থাপন করে একটি উজ্জ্বল রঙের কালারফুল খরগোশ সৃষ্টি করেন। ক্যাক এর নাম দেন অ্যালবা।[৮] প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্লুরোসেন্ট খরগোস সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব স্যাপিয়েন্সকে অধিকমাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হলে মানুষ শুধু প্রযুক্তি নির্ভর হবে না, মানুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা অনেকাংশে প্রযুক্তির উপর নির্ভর করবে। জ্ঞানী মানুষের জন্ম, মৃত্যু রহস্য অর্থাৎ মানুষের জন্ম মৃত্যুর হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করবে প্রযুক্তির উপর। মানুষ দ্রুত জন্মশাসন সফল করেছে। ভবিষ্যতে প্রযুক্তির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মৃত্যু প্রলম্বিত করবে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি চিন্তাবিদ সাইদুর রহমান ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, "এমন একটা ক্ষীণ আশা আজ আমার করতে ইচ্ছা করছে যে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মানব জীবন একদিন হয়তো মুক্তি পাবে। আমি সেদিন বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আমার প্রজাতি বেঁচে থাকবে এবং প্রতিটি মানুষ সেদিন হবে অনন্ত জীবনের অধিকারী।"[৯] বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মৃত্যু হলো যান্ত্রিক সমস্যা। যান্ত্রিক সমস্যাকে সমাধান করা সম্ভব। আশার কথা হলো মৃত্যুকে প্রলম্বিত করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত

ব্রিটিশ নাগরিক পাঁচ বছর বয়সি তাফিতা রাকিব ট্রমাটিক ব্রেন ইঞ্জুরি হয়ে লন্ডনের রয়েল হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। সাত মাস চিকিৎসার পর লন্ডনের ডাক্তাররা বলেছেন তাফিদা ক্লিনিক্যালি মৃত। কিন্তু তাফিদার মা দাবি করেছেন তাফিদার দেহে প্রাণ আছে। ইতালিতে নিয়ে তাফিদাকে চিকিৎসা দিলে তাফিদা সুস্থ হয়ে উঠবে। ইতালির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা তাফিদাকে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে। ব্রিটেনের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাফিদাকে ছাড়তে নারাজ। এখন আদালতের সিদ্ধান্তের উপর তাফিদার জীবন নির্ভর করবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে হাইকোর্ট তাফিদাকে ইতালিতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়।

মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা বহু পুরাতন। নাইজেরিয়ার ইগ্বো (Igbo) সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করতো সৃষ্টিকর্তা মানুষকে প্রথমে অমর করে সৃষ্টি করেছিলো।[১০] পরবর্তী সময়ে মানুষ মৃত্যুর অধীনে এসেছে। মহাভারতে, উপনিষদে মানুষের অমরত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ রয়েছে, "জীবের বিনাশ নেই, দেহ নষ্ট হলে জীব দেহান্তরে যায়। কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে গেলে অগ্নি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীর ত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে।"[১১] প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে মানুষ অমরত্ব লাভ না করলেও গড় আয়ু বেড়েছে। জীবাণুর বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অনেক জীবাণুকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবর্গ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রুত এগিয়ে চলছে। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার সাথে কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তার সংযোগ একুশ শতকে কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। উন্নত বিশ্বে মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোগের গবেষণা বহুদূর অগ্রসর। সাইবর্গ ইঞ্জিনিয়ারিং হলো অর্গানিক এবং ননঅর্গানিকের সংমিশ্রণ।

জীবনকে সহজ সরল ও নান্দনিক করার জন্য মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে। প্রযুক্তি হলো ব্যবহারিক বিজ্ঞান। শিকারী মানুষ হিংস্র পশু থেকে সবসময়ই দূরত্ব বজায় রেখেছে। ফলমূল, লতাপাতা এবং পাখি জাতীয় প্রাণী ছিলো তাদের পুষ্টির প্রধান অবলম্বন। যেমন শিকারী মানুষ দ্রুতগতি সম্পন্ন মোরগ শিকার করতে অসুবিধা হতো তখন সে দ্রুতগতির মোরগের সঙ্গে অপেক্ষকৃত স্থুল মোরগীর প্রজনন ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গতিসম্পন্ন নতুন প্রজাতির মোরগীর সৃষ্টি করে। মানুষের এই জ্ঞান ছিলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। বর্তমানে বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবর্গ ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা অর্গানিক লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে স্থুল মুরগী এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন মোরগের ব্রিডিং করার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া মানুষ এক মুহূর্ত কল্পনা করতে পারে না। বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, তথ্যবিজ্ঞান ও আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম সবই প্রযুক্তি নির্ভর। খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির নিশ্চয়তা, জন্মশাসন, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, আবহাওয়ার উপর প্রভাব কোথায় নেই প্রযুক্তির ব্যবহার? জলে, স্থলে, আকাশে সবস্থানেই প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ আধিপত্য করছে। জেনেটিক প্রকৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ফলে মানুষ বহু রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। করোনার টিকা দ্রুত সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে এসেছে। ডায়াবেটিস, ক্যান্সার নিরাময় যোগ্য রোগে পরিণত হতে যাচ্ছে। এন্টিবায়োটিকসহ বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এন্টিবায়োটিকের অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে স্যাপিয়েন্স হয়তো আগামী দিনে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। "জীবাণু বিধ্বংসী অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। ব্যাকটেরিয়াতে

genetic mutation হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার না করলে এটা ত্বরান্বিত হয়। ইতোমধ্যে অনেক জীবাণু একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে।"[১২] অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, কিন্তু এর অপরিকল্পিত ব্যবহারে আগামী দিনে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী।

কৃষি উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। জিনগত পরিবর্তনের ফলে টমেটো পাঁকে কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট না হয়ে থেকে যায়। বন্যা, খরা সহনশীল ধানের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেগুন, পেঁপে, আলু, ভুট্টাসহ আরো অনেক ফসলের জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। খাদ্যের গুণগত মানউন্নয়নে জেনেটিক প্রকৌশলীরা কাজ করে যাচ্ছে। জিন ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভিটামিন–এ যুক্ত গোল্ডেন রাইসের চাষ হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে জিন সম্পাদনা করে ফসলের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির লগ্নি বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বহুজাতিক কোম্পানী। ফলে তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক চাষি মানবেতর প্রাণীর মতো শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে। সেন্টু পাইজাম ধানের উদ্ভাবক সেন্টু হাজং[১৩] মনে করেন, কৃষি উপকরণ কৃষকের হাতে দিতে হবে। স্থায়ীত্বশীল কৃষি উৎপাদনের জন্যে কৃষক যেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন ফসল উদ্ভাবন করতে পারে সেই প্রশিক্ষণ কৃষককে দেওয়া জরুরী।

অন্তর্জাল, ফেইসবুক ইত্যাদি আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ডাক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ডাক হরকরা এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। ই-বুক, ই-লাইব্রেরী, ই-গবেষণাগারের ব্যবহার হচ্ছে। একটি মোবাইল ডিভাইসে কয়েক হাজার বইয়ের কপি সংরক্ষণ করা যায়। ২০২০ সালের বাংলা একাডেমি আয়োজিত বই মেলায় বৃষ্টিতে কোনো স্টলের ক্ষতি হয়নি। কারণ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অগ্রিম আবহাওয়ার সংবাদ প্রকাশকেরা সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নিয়েছিলো। কৃষক জমিতে কখন কীটনাশক, সার প্রয়োগ করবে তা সহজেই জানতে পারে। বন্যা খরার খবরও পাওয়া যায় অগ্রিম।

প্রযুক্তি বিশ্বায়ন সম্ভব করেছে। বিশ্বের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বর্তমানে আন্তর্জালের সাথে যুক্ত। এই আন্তর্জাল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে কাছাকাছি আনতে সক্ষম হয়েছে। ই-মেইল, ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব। আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চলের খবর বাংলাদেশে পৌঁছতে এখন সময় লাগে কয়েক সেকেণ্ড। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নির্মূলে প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে মিনিটেই টাকা চলে যাচ্ছে দেশের যেকোনো প্রান্তে। ফলে ক্ষুদ্র আয় এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষের দৈনন্দিন জীবন অনেক সহজ হয়েছে। চাঁদে মানুষের অবতরণ, মঙ্গলে অভিযান, বিকল্প পৃথিবীর সন্ধান ইত্যাদি প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণকর দিক বলে শেষ করা সম্ভব নয়। মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে প্রযুক্তি।

প্রযুক্তি মানুষকে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ দেওয়ার বিপরীতে প্রযুক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণও করছে। প্রযুক্তির লাগামহীন ব্যবহারের ফলে এই গ্রহটি মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর আয়ু কমে আসছে। পরমাণুকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবন যেমন সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে তেমনি পারমাণবিক বোমাও তৈরি হয়েছে। পরিসংখ্যান মতে এ পর্যন্ত মজুদ সমরাস্ত্র দিয়ে পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির আবর্জনা পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ। যে

প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে সেই প্রযুক্তিই মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, পারমাণবিক বিকিরণ এবং শিল্প বর্জ্যের ফলে পরিবেশের ক্ষতিসাধন ও গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারের ফলেই হয়েছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন যেমন সহজ হচ্ছে তেমনি কণ্টকময়ও হচ্ছে। মানুষের উপর প্রযুক্তির আধিপত্য নিয়ে দার্শনিকরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন। দার্শনিকদের এইসব কর্মকাণ্ড নিয়ে জ্ঞানের জগতে যে নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে তাই প্রযুক্তির দর্শন। প্রাকৃতিক মানুষ প্রযুক্তি নির্ভর মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর জিন সম্পাদিত মানব আর প্রাকৃতিক মানব এক নয়। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এই পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সের বয়স কমে আসছে।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জানতে চায়। প্রযুক্তি কেবল জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। প্রযুক্তিকে বলা হয় ফলিত বিজ্ঞান।[১৪] নিউটনের গতি সম্পর্কিত তৃতীয় সূত্রকে কাজে লাগিয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে। মঙ্গলে যাওয়ার চেষ্টা এখন স্বপ্ন নয়। সবকিছু ঠিক থাকলে নাসার কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানী এলিসা কার্সন ২০৩৩ সালে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন।

প্রযুক্তির জ্ঞান মানুষের বয়সের সমান হলেও প্রযুক্তির দর্শন জ্ঞানকাণ্ডে নতুন। জার্মান দার্শনিক আর্নস্ট ক্যাপ (১৮০৮-১৮৯৬) প্রযুক্তির দর্শন শব্দ দুটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রযুক্তির দর্শন জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রেডরিক ডেসেয়ার (১৮৮১-১৯৬৩), কার্ল জেসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯) এবং ইউজেন ডিজেল (১৮৮৯-১৯৭০) প্রযুক্তির দার্শনিক দিকটি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এ পর্যন্ত প্রযুক্তির দর্শন জার্মানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জ্যাক এলু, আলবার্ট বর্গম্যান, ডন ইডে, রোজার ফেলোস, এন্ড্রু ফিনবার্গ, ডেভিড এম. কাপলান, সার্জিও সিসমন্ডো, কান্তিকা ওয়েলবার্স প্রমুখ প্রযুক্তির দর্শন বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রযুক্তির দর্শন বিকাশে পেশাজীবীদের সংগঠন, সোসাইট ফর ফিলোসফি এন্ড টেকনোলজি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সোসাইটি ফর দ্যা হিস্টরি এন্ড টেকনোলজি প্রযুক্তির সাথে সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, পরিবেশ ইত্যাদি আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।[১৫] প্রযুক্তির দর্শনের বিভিন্ন শাখা সৃষ্টি হয়েছে। নারীবাদী প্রযুক্তির দর্শন নামে জ্ঞানের জগতে দর্শনের একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। একদল নারীবাদী মনে করেন প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে প্রজননে পুরুষের কর্তৃত্ব কমেছে। প্রজননে নারী নিজের উপর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্যে, পুরুষের সহযোগিতার প্রয়োজন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হলে প্রযুক্তির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রযুক্তির দর্শনের প্রসারও ঘটবে।

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস। পিথাগোরাস ছিলেন অর্ধদার্শনিক এবং অর্ধ অতীন্দ্রিয়বাদী। মানবের উৎপত্তি সংক্রান্ত জ্ঞানকাণ্ডে, পিথাগোরাস দাবি করেন, সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা নেই। তিনি মনে করতেন ভ্রূণের সকল বৈশিষ্ট্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল। "পিথাগোরাস যুক্তি দিয়েছিলেন যে একটি ভ্রূণ সৃষ্টি করার অপরিহার্য তথ্যগুলোর জোগান দেয় একজন পিতা এবং মায়ের গর্ভ এটিকে পুষ্টি সরবরাহ করে যেন এই হস্তান্তরিত তথ্য বা উপাত্ত একটি শিশুর

রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। এই তত্ত্বটি একটি পর্যায়ে 'স্পার্মিজম' নামে পরিচিতি পেয়েছিল।"[১৬] গ্রিক চিন্তাবিদ পিথাগোরাস ছিলেন প্রচণ্ড রকমের পুরুষতান্ত্রিক। তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে গৌণভাবে উপস্থাপন করেছেন। গ্রিক নাট্যকার ইস্কাইলাস (Aeschylus) পিথাগোরাসের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে পিথাগোরাসের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অভিমত তাঁর ইউমেনিডেস নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

> ইস্কাইলাসের ইউমেনিডেস নাটকটির মূল বিষয় ছিলো, ওরেস্টেসের বিচারকার্য; আরগসের এই রাজকুমারকে তার মা ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রায় সব সংস্কৃতিতেই মাতৃহত্যাকে নৈতিক বিচ্যুতি ও বিকৃতির একটি চূড়ান্ত কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইউমেনিডেসের হত্যাকাণ্ডের এই বিচারক্রিয়ায় ওরেস্টেসকে প্রতিনিধিত্ব করতে নির্বাচিত অ্যাপোলো লক্ষণীয়ভাবে একটি মৌলিক যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, ওরেস্টেসের মা, তার কাছে একজন আগন্তুক ছাড়া আর বেশি কিছু নয়।[১৭]

নারীর জরায়ুকে তিনি বলেছেন, A pregnant Women is just a glorified human incubator.[১৮] নারীর জরায়ু শুধু আশ্চর্যজনক ইনকুবেটর নয়। নারী শিশুকে পুষ্টিদান করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই।

> অ্যাপোলো দাবি করেছিলেন, নারীর গর্ভ যা শিশুকে ধারণ করে সেটি প্রকৃত জন্মদাতা নয়। অ্যাপোলো উপস্থিত সহানুভূতিপূর্ণ বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তিনি শুধু সদ্য-বপন-করা একটি বীজের যত্ন নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নারী, তার জন্য অচেনা একজন, ব্যক্তির মতোই অচেনা – তিনি শুধু জীবনের বীজকে তার শরীরে ধারণ করেছিলেন।[১৯]

পিথাগোরাসের শিষ্যরা জ্যামিতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতীয় এবং ব্যাবিলনীয়ানদের কাছে থেকে পিথাগোরিয়ানরা জ্যামিতির ধারণা অর্জন করেছিলেন। "পিথাগোরিয়ানরা প্রস্তাব করেছিলেন যে বংশগতির ক্ষেত্রেও ত্রিভুজাকৃতির একটি 'হারমনি' কাজ করছে। মা এবং বাবা হচ্ছেন সেই ত্রিভুজের দুটি পৃথক পার্শ্বদেশ, এবং শিশুটি হচ্ছে সেই ত্রিভুজের তৃতীয় পার্শ্বদেশ; পিতা ও মাতার দুটি রেখার বিপরীতে জৈববৈজ্ঞানিক একটি অতিভুজ।"[২০] বংশগতি সম্পর্কে পিথাগোরাসের দাবি জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

পিথাগোরাসের 'ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির' ধারটিকে অ্যারিস্টটল চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। অ্যারিস্টটল দাবি করেন জন্মের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা রয়েছে। নারী পুরুষের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ মানবের জন্ম হয়। অ্যারিস্টটলের সময় থেকে পিথাগোরাসের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে। পিথাগোরিয়ানদের 'স্পার্মিজম' তত্ত্বটি অ্যারিস্টটল প্রত্যাখান করে লিখেন *জেনারেশন অব অ্যানিমলস* গ্রন্থটি। অ্যারিস্টটলের এই বইটি মানব জিন বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।[২১] চার্চ নিয়ন্ত্রিত ইউরোপের জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে অ্যারিস্টটলের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অবরুদ্ধ ছিলো। চার্চ নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্লেটো সমাদৃত ছিলো। ত্রয়োদশ শতকের পর অ্যারিস্টটল উন্মুক্ত হতে শুরু করে।

রেনেসাঁস উত্তরকালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি পায়। ডারউইনের পর জীববিজ্ঞানে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ডারউইন প্রথম বলেছিলেন মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতই একটি প্রাণী। "ডারউইন কল্পনা করেছিলেন, সব জীবের কোষগুলো খুবই ক্ষুদ্র কণাসদৃশ্য পদার্থ তৈরি করে যা, বংশগতিসংক্রান্ত তথ্য বহন করে–তিনি সেগুলোর নাম দিয়েছিলেন, 'জেমিউল'। এসব জেমিউল পিতামাতার শরীরে সঞ্চালিত হতে থাকে।"[২২] আধুনিক বংশগতি সংক্রান্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করতে আমাদের মেন্ডেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। মেন্ডেলের আবিষ্কারের পর নারী পুরুষের সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে অধিবিদ্যকতত্ত্বের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

নারী পুরুষ নির্ধারিত হয় XX এবং XY ক্রমোজম থেকে। Y ক্রমোজম পুরুষ বহন করে। নারী সৃষ্টি হয় পুরুষ থেকে। কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্মের জন্য বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে বহু নারী বঞ্চনা-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। Y ক্রমোজম কেনো X ক্রমোজমের সাথে পিথাগোরাসের মতে আশ্চর্যজনক মাতৃ-জরায়ুতে কীভাবে মিলে সে প্রক্রিয়াটি এখনো অজ্ঞাত।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডলির সৃষ্টি জিনতত্ত্ব গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। নতুন প্রক্রিয়ায় মানব সৃষ্টির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। ২০১৮ সালে একজন বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন তিনি মানুষের দুটি ভ্রূণের জেনেটিক পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিলো শিশু দুটির এইডস রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই ঘোষণার পর চীন দেশের সরকার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করে বিজ্ঞানীকে শাস্তি প্রদান করে।[২৩] প্রযুক্তির এই উন্নয়ন উন্নত বিশ্বে নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু দান করা, ডিম্বাণু ফ্রিজ করে রাখা ইত্যাদি বহু আগেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বয়স্ক নারী সন্তান ধারণে সক্ষম হয়েছে। আমরা জরায়ু ভাড়া (Surrogate mothers) করার কথা জানি।[২৪] উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যেসকল রোগ বহন করে সেগুলো জিন ব্যবস্থাপনা করে নিরোগ মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। "DNA তে ত্রুটির জন্য যেসব জেনেটিক রোগ হয়, সেগুলো কেবল প্রযুক্তির সাহায্যেই দূর করা সম্ভব। যদিও এখন পর্যন্ত সাফল্য বেশি নয়, কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতি সফলতা বাড়তে পারে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহে পরিবর্তন ঘটতে থাকে–এগুলোর ভিত্তিও DNA তে।"[২৫] সাদা খরগোসের সঙ্গে জেলিফিসের ডিএনএ ব্যবস্থাপনা করে দৃষ্টিনন্দন খরগোস সৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার পর এরকম কাজ অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, "ভবিষ্যতে শিশু জন্মগ্রহণ কারার আগেই তার জিন পরিবর্তন করে ভাল চেহারা, অধিক বুদ্ধিমত্তা, অধিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এগুলো দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"[২৬] জিন সম্পাদনা করে তৈরি মানব শিশু আর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার জন্মানো শিশুর কর্মক্ষমতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। জিন সম্পাদনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ নামের মানবেতর প্রাণীদের পক্ষে এই প্রক্রিয়ায় মানব উৎপাদন স্বপ্নের মধ্যেই থেকে যাবে।

আমরা বায়োনিক হাতের কথা জানি। বায়োনিক জ্ঞানী মানুষ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। শ্রবণ শক্তিহীন মানুষের কানে যন্ত্র লাগিয়ে শ্রবণক্ষম করা যচ্ছে। প্রেসমেকার লাগিয়ে হৃদযন্ত্র কার্যকর করা হচ্ছে। এগুলো সবই সাইবর্গ ইঞ্জিনিয়ারিং।[২৭] ফেইসবুকে ভাইরাল হওয়া একটি খবর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। একটি মেয়ে হৃদপিণ্ড পিঠের পিছনে ব্যাগের মধ্যে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা যাবে। মস্তিস্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার সক্ষমতা মানুষ অর্জন করতে পারে। জার্মান সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত কোম্পানি 'রেটিনা ইমপ্লান্ট' কৃত্রিম রেটিনা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।[২৮] এই রেটিনার সাহায্যে দৃষ্টিহীন মানুষ পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার সুযোগ পাবে। আমাদের দেশে মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার মধ্যে কৃত্রিম পা সংযোজন করে একজন মানুষ সাধারণভাবে চলাফেরা করতে পারে। এসবই সাইবর্গ। আমরা সাইবর্গের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। সাইবর্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হলো,

> মানুষের মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের মধ্যে একটি সরাসরি দ্বিমুখী সাধারণ যোগাযোগ ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা, যা কম্পিউটার মস্তিষ্ক প্রেরিত সংকেত পড়তে এবং মস্তিষ্ককে সঙ্কেত পাঠানো যাবে এবং মস্তিষ্ক সেটি পাঠ করতে পারবে। যদি এর মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সরাসরি ইন্টারনেটের সাহায্যে অন্য মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের সাথে যোগ করা যায় তাহলে অন্য মস্তিষ্কের হারিয়ে যাওয়া তথ্য উদ্ধারে সহায়ক হবে।[২৯]

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে স্যাপিয়েন্স কি আর স্যাপিয়েন্স থাকবে? কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা দ্রুত সক্ষমতা অর্জন করছে।

> ২০১৬ সালে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন ছিল Stockfish নামে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যে চ্যাম্পিয়ন হল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তার প্রোগ্রামে দেওয়া আছে শতাব্দীর অভিজ্ঞতা। এ প্রোগ্রাম প্রতি সেকেন্ডে ৭ কোটি দাবার চাল বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু গুগলের আলফা জিরো নামে আর একটা প্রোগ্রাম এসে তার স্থানচ্যুত করল। আলফা-জিরোকে দাবা খেলার নিয়ম ছাড়া আর কিছু শিখানো হয়নি। মাত্র নয় ঘণ্টা মহড়া দেওয়ার পর স্টকফিস এর বিরুদ্ধে খেলে আলফা-জিরো ১০০টা খেলার মধ্যে ২৮ টি জিতল ও ৭২ টি ড্র করল, কোন খেলাতেই সে হারেনি। শতাব্দীর অভিজ্ঞতা তার ছিলো না, কিন্তু নয় ঘণ্টা সে নিজের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ বার খেলেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বিশ্ব সেরা হতে পেরেছে।[৩০]

প্রাকৃতিক বুদ্ধিমতা কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তার নিয়মে পরিচালিত হয়। 'অপরাজিতা' স্বাভাবিকভাবেই খবর পাঠ করেছে। প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে মানুষের বর্তমান প্রজাতির দিন কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? হোমো স্যাপিয়েন্সের স্থান কি দখল করবে অন্য কিছু। ইয়ুভাল নোয়াহ হারারি এই প্রজাতির নাম দিয়েছেন হোমো ডিউস (Homo Deus) বা ঈশ্বর মানব। আবার অনেকে বলছেন Post Human. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে।[৩১]

স্যাপিয়েন্সের পূর্বপুরুষ প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। শিকারী মানুষ প্রযুক্তির সাহায্যে শিকার ধরেছে। কৃষি সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তি নির্ভর। প্রথম এবং দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব স্যাপিয়েন্সকে অধিকমাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হলে মানুষ শুধু প্রযুক্তি নির্ভর হবে না, মানুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা অনেকাংশে প্রযুক্তির উপর নির্ভর করবে। জ্ঞানী মানুষের জন্ম, মৃত্যু রহস্য অর্থাৎ মানুষের জন্ম মৃত্যুর হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করবে প্রযুক্তির উপর। বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবর্গ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রুত এ কাজ সম্পন্ন করবে। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার সাথে কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তার সংযোগ এগিয়ে চলেছে। ফলে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর পর থেকে যাবে তার মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা। প্রযুক্তির দর্শন জ্ঞানকান্ডে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দর্শনের একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রযুক্তির দর্শন জ্ঞানকান্ডের অন্যতম একটি শাখা।

তথ্যসূত্র

১ Yuval Noah Harari, *Sapiens*, (Vintage Book, London, 2014), p. 6-7

২ Yuval Noah Harari, *Sapiens*, p. 451

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪ ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগে ভারতে প্রযুক্তির ব্যবহার (৬৫০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ)*, শুভাশিস ঘোষ (অনুদিত), (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২৩), পৃ. ১১

৫ Yuval Noah Harari, *Sapiens*, p. 6

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭

৯ সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, (যায়যায়দিন প্রকাশনী, ১৯৯৫,) পৃ. ১৬৮

১০ Yuval Noah Harari, *Homo Deus,* (Harvill Secker, London, 2015), p. 47

[১১] কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত, *মহাভারত*, রাজশেখর বসু (অনুদিত), (নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯), পৃ. ৫১০
[১২] ড. মাহমুদ হাসান, *জাগিয়ে তোল প্রাণ*, (অভিযান, ঢাকা, ২০২২), পৃ. ১৭১
[১৩] সেন্টু হাজং, সেন্টু পাইজমসহ ২৩ প্রজাতির ধান উদ্ভাবন করেছেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় সেন্টু পাইজাম ধান কৃষকের কাছে বেশ জনপ্রিয়। সেন্টু পাইজাম ধান খরা সহিষ্ণু এবং অধিক ফলন হয়। সেন্টু হাজং এর বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায়।
[১৪] Val Dusek, *Philosophy of Technology*, (Blackwell, uk, 2006), p. 6
[১৫] মো. নূরুজ্জামান, *প্রযুক্তির দর্শন*, (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬), পৃ. ৬৩
[১৬] সিদ্ধার্থ মুখার্জি, *জিন*, কাজী মাহবুব হাসান (অনুদিত), (দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২৩), পৃ. ৩৬
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
[১৮] Siddhartho Mukherjee, *The Gene*, (Penguin Books, India, 2017), p. 18
[১৯] সিদ্ধার্থ মুখার্জি, *জিন*, কাজী মাহবুব হাসান (অনুদিত), পৃ. ৩৭
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
[২৩] মাহমুদ হাসান, *জাগিয়ে তোল প্রাণ*, পৃ. ১৭৮, ১৭৯
[২৪] Jurgen Habermas, *The Future in Human nature*,(Polity, 2003), p. 16
[২৫] ড. মাহমুদ হাসান, *জাগিয়ে তোল প্রাণ*, পৃ. ১৮০
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
[২৭] Yuval Noah Harari, *Sapiens*, p. 454
[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩
[২৯] প্রাগুক্ত, ৪৫৬
[৩০] মাহমুদ হাসান, *জাগিয়ে তোল প্রাণ*, পৃ. ১৮২
[৩১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮২), পৃ, ২০৮